পঞ্চম অধ্যায়

জীবনদৃষ্টি

ঔপন্যাসিকের জীবনদর্শন ও তাঁর জগত — সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যে তারাশংকরের পল্লীময় জীবনদৃষ্টির নূতনত্ব — সাফতশ্রেণীর সমালোচনা — মৃত্তিকাপ্রীতি - সমাজচেতনা : নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব ; প্রাচীনের প্রতি অনতিপ্রবন, অসচেতন মোহ ; বিপ্লব ও কমিউনিজম ; গান্ধীবাদ ; মার্কসবাদ ; রোমান্টিকতা ও বাস্তবতার মাত্রা ; বাস্তবিকতার ৩টি — শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাব — জৈবিক আবেগের সহজ স্বীকৃতি — জীবনরহস্যের রসিক দ্রষ্টা — গভীর মানবপ্রেম — সমমনুষ্যচেতনা — স্থানবিশেষে দৃষ্টির অস্পষ্টতা ও অসঙ্গতি — জানপদ — জীবন ও তাঁর জীবনবোধে সরলতার সাফল্য ॥

[৮]

...' poetry is at bottom a criticism of life.' ১

ম্যাথু আর্নল্ড -এর একথা উপন্যাসের ক্ষেত্রে অধিকতর সত্য । জীবনচিত্রের উপস্থাপনায় বাস্তবের মায়া বা বিভ্রম সৃষ্টি করা ঔপন্যাসিকের একটি দায়িত্ব বটে , উপন্যাস কিন্তু জীবনের যথাদৃষ্ট রূপমাত্র নয় । লেখকের সচেতন প্রয়াসযোগে বা ব্যতিরেকে প্রত্যেক উপন্যাসেই বিষয়বস্তু ও ঘটনা পরিকল্পনা, পাত্রপাত্রীর আচরণ ও আবেগ এবং লেখকের বিশ্লেষণী মন্তব্যাদির মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনদর্শন বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশ পায় । ওয়াল্টার এলেনের ভাষায় —

'Every novelist, then, gives us in his novels his own personal, idiosyncratic vision of the world. The vision is acted out by images of men and women. It is, so to speak, populated; and this is why we may quite legitimately talk about a novelist's 'world'.' ২

১। Matthew Arnold - Essays in Criticism. Second Series, 1938. Macmillan And Co. Ltd. London. P.85

২। Walter Allen - The English Novel 1960 Pelican. P.17

বীরভূমকে কেন্দ্র করে 'রাঢ়' জনপদ ঔপন্যাসিক তারাশংকরের সেই ওয়ান্টার অ্যালেন কথিত নিজস্ব 'জগত' । এখানকার প্রকৃতি পরিবেশ, সমাজ ও জনজীবনের সান্নিধ্যে আহরিত উপলব্ধিই তাঁর রাঢ়ভিত্তিক সাহিত্যের মাধ্যমে বিধৃত হওয়া স্বাভাবিক ।

আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত উপন্যাসসমূহে প্রকাশিত জীবনবোধ তারাশংকরের অপরাপর রচনাধারায় প্রতিফলিত দর্শন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয় । তাঁর সমগ্র জীবনদর্শনের একটা বৃহৎ অংশ বর্তমান উপন্যাসগুলিতে খুঁজে পাওয়া যাবে । অপরাপর রচনায় প্রকাশিত ধারণা এর পরিপূরকরূপে বিবেচ্য । কারণ, তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি আঞ্চলিক পোত্রের এবং সমগ্র সৃষ্টিকর্মে এদের সংখ্যার পরিমাণ যথেষ্ট বেশি । এগুলির বিশ্লেষণের সাহায্যে ঔপন্যাসিক তারাশংকরের জীবনচেতনার স্বরূপ উপলব্ধি আমাদের বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনার লক্ষ্য ।

হরপ্রসাদ মিত্রকে তারাশংকর বলেছিলেন —'আমি জীবনের গভীর রহস্যবোধের তাড়নাতেই আমার গল্প উপন্যাস লিখেছি ।' [৩] — এ থেকে বোঝা যায় অঞ্চলের টানে কাহিনী গড়ে ওঠে নি, জীবনবোধের উৎসরূপে অঞ্চল এসেছে । মনে হয়, নৈকট্যহেতু এখানেই তিনি মানবজীবনের অন্তত রহস্য বা শাশ্বত সত্যের সাক্ষাৎ পেয়েছেন আর সাহিত্যে সেই অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধি প্রকাশে রাঢ়ের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যময় জনজীবন তাই তাঁর কাছে অপরিহার্য মনে হয়েছে । তারাশংকরের অনেক রচনায় বক্তব্য ও তত্ত্বকথা কেন সোচ্চার ও সুপ্রকাশ তার কারণ উদ্ধৃত স্বীকারোক্তিতে নিহিত । বক্তব্যের এই স্পষ্টতা ও প্রবলতা লক্ষ্য করে ভূদেব চৌধুরী একটি সমত মন্তব্য করেছেন —

'তারাশংকরের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান তাঁর রচনার অন্তর্নিহিত স্পষ্টোচ্চারিত জীবন-বাণী , — যাতে মৃত্তনধর্মের ঐতিহাসিক গুণ এবং প্রকরণগত সুভাব দুইই

৩। হরপ্রসাদ মিত্র —'তারাশংকরের পরিশ্রম ও কৃতজ্ঞতাবোধ'
অমৃত , ১৮ কার্তিক ১৩৭৮

একসঙ্গে ধরা পড়েছে।' [৪]

কল্লোলের কালে তারাশঙ্কর উত্তুঙ্গ পর্বতচূড়ার মতই বাংলা সাহিত্যের পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তাঁর পল্লীপ্রাণতা, বিচিত্র জীবনরূপিপাসা ও মরণ জীবন-প্রত্যয় নিয়ে। সাহিত্যজগতে তাঁর প্রবেশকালে বাংলা কথাসাহিত্যে প্রাধান্য পাচ্ছিল তারুণ্যের রোমান্টিকতার সঙ্গে সামাজিক অস্থিরতার ছবি। লেখকেরা ছিলেন নাগরিক মনোভাবাপন্ন — প্রচলিত জীবন সম্পর্কে সন্দেহ ও অনাস্থা এবং ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। অনেকে জীবনসংগ্রামী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টি রাখলেও ব্যর্থতা ও শূন্যতার বোধ ব্যাপক হয়ে উঠেছিল। বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবে বুদ্ধি ও চাতুর্যের চর্চা হচ্ছিল কিন্তু বাংলার মাটি ও মানুষের পরিচয় সামান্যই ফুটছিল। এর পাশাপাশি তারাশঙ্করের গল্পে, উপন্যাসে গ্রাম-চলের মানুষের কথা, মানবপ্রেমমিশ্রিত আশাবাদ, সাধারণ দীন মানুষের মধ্যেও মহত্তর আনন্দবেদনার সন্ধান ও মহিমা-নিরূপণ পাঠকের বুদ্ধিকে নয়, হৃদয়কে তৃপ্ত করেছিল।

তারাশঙ্কর যে বাংলা সাহিত্যে এক স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ মনোভাব নিয়ে লেখা শুরু করেছিলেন সে বিষয়ে তিনি নিজেও সচেতন ছিলেন। সমকালীন অন্যান্যদের লেখায় পরিব্যাপ্ত তৃপ্তিহীন অস্থিরতা ও বিদ্রোহের সুরের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি নিজের রচনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন —

'আমার নিজের সাহিত্যের মধ্যে আমি যা বলেছি, তা সুস্পষ্টভাবে সেকালের সাহিত্যের বক্তব্যের থেকে পৃথক। আমি সাহিত্যক্ষেত্রে এসেছিলাম স্বাভাবিক আলাদা দৃষ্টিকোন নিয়ে, অন্তরের স্বতন্ত্র উপলব্ধি নিয়ে। চৈতালী ঘূর্ণিতে আমি তা প্রথম বলতে চেষ্টা করেছিলাম। • • • ধাত্রীদেবতা, কালিন্দীতে নোতুন করে সেইকথা বলে আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।' [৫]

৪। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার ১৩৫২ মডার্ণ বুক এ কলি• পৃ ৫৯১

৫। অভিভাষণ, বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, সিউড়ি। শনিবারের চিঠি, বৈশাখ ১৩৭৪

[খ]

তাঁর ঔপন্যাসিক - জীবনভাষ্য আঞ্চলিক উপন্যাসগুলির পৃষ্ঠা থেকে উপলব্ধি করা এখন আমাদের উদ্দেশ্য ।

(১) নিজে একজন জমিদার হওয়ায়ে এবং জমিদারগোষ্ঠীর সঙ্গে সংস্রবের ফলে তারাশংকর রাঢ়ের জমিদারদের দম্ভ, জীবনতৃষ্ণা , শ্রেণীগত সংকট ও ব্যক্তিগত অন্তর্বেদনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন । সাহিত্যে এদের চরিত্র অংকনে নৈকট্যহেতু কিছু মমতা যুক্ত হয়েছে বটে কিন্তু তা খুব অস্বাভাবিক বা নিন্দার্হ নয় । ভাল ফল যাই হোক বিরাট, গাম্ভীর্যপূর্ণ কিছু একটা যখন চিরবিদায় নেয় তখন সংবেদনশীল চিত্তে তার জন্য বেদনা জাগা স্বাভাবিক । উচ্ছৃঙ্খল ভোগী অত্যাচারী জমিদার জীবানন্দ চরিত্রও তো শরৎচন্দ্রের অন্তরস্পর্শে 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে পাঠকের অনুকম্পা জাগায় ।

সামন্ত সম্প্রদায়ের অনিবার্য পরাজয়কে লেখক সময় ও সমাজের বাস্তব পট - ভূমিতেই দেখাতে চেয়েছেন । ধাত্রীদেবতা , গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, ক্ষণীপণ পাঠশালা উপন্যাসে অনেকটা নিরাসক্তভাবেই তিনি দেখিয়েছেন একদিকে শিল্পায়ন ও শহরের প্রসার, পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থা, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জন অপরদিকে জমিদারদের আত্মকলহ ও সম্পত্তি বিভাগহেতু আয় হ্রাস, বনেদীয়ানার মোহে বিলাসব্যয়, দম্ভবশতঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মাত্রাবোধের অভাব, আত্মমর্যাদা ও সম্পত্তিরক্ষায় জ্ঞাতি-শরিক এবং নবাগত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বিরোধ ঘটিত মামলাখরচ - প্রভৃতি কারণযোগে সামন্ততন্ত্রের অবসান অবশ্যম্ভাবী এবং ত্বরান্বিত । জমিদারদের নির্মম নিষ্পাপ করে দেখাবার প্রয়াস তো কোথাও দেখি না ।'চৈতালী ঘূর্ণি'তে জমিদারদের মুদখোর মহাজন ও কাবুলিওয়ালার সমস্তরের শোষণকারীরূপে দেখিয়েছেন । স্মৃতিকথায় বিবেকহীন জমিদার কেমন করে বিধবা ভ্রাতৃবধূর সম্পত্তি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে তার বর্ণনা দিয়েছেন । [৩] কালিন্দীতে ইন্দ্রনারায়ের ব্যক্তিত্ব ও পরাজয় বর্ণনায় লেখকের সহানুভূতি

৩। তা. সা. জী. (১) পৃ ৪১

প্রকাশ পেয়েছে , তবু সাঁওতাল ও অন্যান্য প্রজাদের উপর জুলুম ও প্রহারের ঘটনাও উপন্যাসটিতে আছে । মিলমালিক বিমলবাবু কর্তৃক সারীকে লাঞ্ছিত ও সাঁওতালদের ভূমিচ্যুত করার ঘটনা যে জমিদারদের চিরাচরিত প্রজাপীড়নের সামিল জমিদারপুত্র অহীন্দ্রের মাধ্যমে তা ব্যক্ত হয়েছে । শিবনাথ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বীরভূমের প্রজাদের দুর্দশায় দুঃখ প্রকাশ ক'রে তাদের ফরাসী বিপ্লবকালীন সে দেশের শোষিত মানুষের সঙ্গে তুলনা করেছে । ক্ষুধার্ত, শীর্ণ, ভিক্ষুকাকে দেখে শিবনাথের আত্মগ্লানিবোধে কপটতা নেই । পুরুষানুক্রমে দুর্বল ও দরিদ্রকে বঞ্চনা ও শোষণ করার জন্য সে নিজেকেও অপরাধী সাব্যস্ত করেছে । এবং প্রায়শ্চিত্ত - বাঞ্ছায় সে জমিদারী গোঁসাইবাবার আশ্রমে দান করে কৃষি ও পল্লীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে । যুবক অহীন্দ্রের কারাবাসের ঘটনাও লেখক তার পূর্বপুরুষদের যাবতীয় পাপের শাস্তিরূপে দেখাতে চেয়েছেন ।

(২) জমিজমা দেখাশোনা, খাজনা আদায় প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়ে তারাশংকর মাটির মূল্য উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর শিল্পিমনে এক নিবিড় মৃত্তিকাপ্রীতি জন্ম নিয়েছে । বীরভূমের গৈরিক মাটির ভৈরবীরূপ কেমন ক'রে বর্ষাসিক্ত হ'য়ে শস্যদায়িনী অন্নপূর্ণামূর্তি ধারণ করে তা তিনি ভক্তি ও মমতামিশ্রিত দৃষ্টিতে দেখেছেন ।[৭] রাঢ়ের হাটে মাঠে গ্রামে ঘুরে ফিরে দিনে দিনে তিনি এই মাটি আর তার বক্ষলগ্ন মানুষকে চিনেছেন । আর এখানকার তীর্থভূমিতে তিনি অনুভব করেছেন ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক জীবনস্পন্দন । তাই বোঝা যায় তাঁর অঞ্চলপ্রীতি , মানবদরদ এবং অধ্যাত্মচেতনা মূলত একই সূত্র থেকে উৎসারিত ।

আঞ্চলিক উপন্যাসসমষ্টিতে বিংশ শতাব্দীর রাঢ় পল্লীতে দীর্ঘকাল - প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, ভূমিব্যবস্থা ও উৎপাদনরীতি, সামাজিক নিয়মবন্ধন, রীতিনীতি ও প্রথা, এমন কি ব্যষ্টির সামাজিক ধ্যানধারণ, দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শ প্রভৃতি ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন ও তার ফলস্বরূপ সদ্যোদ্ভূত সমস্যাবলীর পূর্বাপর বৃত্তান্ত উপস্থিত করেছেন । এই বিপুল রূপান্তরকে অনুভবযোগ্য করতে তিনি কাহিনী ও বিষয়বস্তুতে সংঘাতময় পরিস্থিতি

৭। অভিভাষণ , শনি- চিঠি বৈশাখ ১৩৭৪

সাহায্যে তুলনার অবকাশ রচনা করেছেন। এর মধ্যে অনেক বৃত্তান্তই মূলত প্রাচীন মূল্যবোধ ও নবীন মনোভাবের, বাচ্যান্তরে তাঁর প্রিয় 'সেকাল' ও অপ্রতিরোধ্য 'একাল' — এর বিরোধের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। লক্ষ করা যাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাচীনের প্রতিনিধির প্রতি লেখকের সহানুভূতি নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

তারাশংকরের রচনায় সামন্তশ্রেণীর চরিত্রের ভূমিকাটি প্রথম আলোচনা করা যাক। চলিষ্ণু সমাজের চিত্র অংকনে তিনি 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'পদচিহ্ন' উপন্যাসে বীরভূমের খুদে জমিদারদের সক্ষম্য, অর্থ ও ক্ষমতা হারিয়েও অন্তঃসলিল দাপট, দেমাক, ঔদ্ধত্য ও আভিজাত্য জাহির করার প্রচেষ্টা ও তার করুণ পরিণতি প্রদর্শনে যেন বিশেষ যত্নবান। এক প্রকার মমতা এখানে প্রকাশ পেয়েছে বটে কিন্তু তা 'রায়বাড়ি', 'জলসাঘর', 'সাড়ে সাত শতার জমিদার' প্রভৃতি গল্পে বিধৃত বিষণ্ণ সমবেদনা পর্যায়ের নয়। উপন্যাসে চিত্রিত জমিদার চরিত্রের প্রতি লেখকের আগ্রহাধিক্য অপরাপর উপাদানের তুলনায় অতিরিক্ত মাত্রায়িক নয় এবং চরিত্রগুলি সম্পর্কিত মনোভাব কখনই লেখকের নিঃশর্ত সোচ্চার সমর্থন স্তরে পৌঁছায়নি। মনে হয় সাম্প্রতিক দিনের রাজনৈতিক চেতনার আলোকে তাঁর এই 'দুর্বলতা'কে অধিক গুরুত্ব দিয়ে 'পক্ষপাতিত্ব' প্রতিন্ন করার প্রবণতায় লেখকের প্রতি অবিচার করা হয়।

(৩) বিশ শতকের পল্লীবাংলায় নানা কারণে, বিশেষতঃ দুটি মহাযুদ্ধের জটিল প্রতিক্রিয়ায় প্রাচীন আভিজাত্য, ধ্যান ধারণা ও জীবনছাঁদ যে নিত্য পরাস্ত হয়ে লুপ্ত হতে চলেছে সেই বাস্তবতা - প্রদর্শনে তারাশংকর কুণ্ঠিত নন। সুকান সচেতন মন দ্বারা তিনি অনুভব করেছেন যে প্রাচীনের ধ্বংসের বীজ তার মধ্যেই নিহিত — তার নিজস্ব মূল্য যাই হোক না কেন দিনান্তের বাতাবরণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে না পারলে অচল অনড় অনমনীয় আদর্শ, সংস্কার বৃহত্তর সমাজজীবন থেকে শিথিল, বিচ্ছিন্ন ও বিলীন হয়। বিশুম্ভর রায়, ইন্দ্ররায় প্রমুখ জমিদারদের পশ্চাদপসরণ ও নতশিরে দেশত্যাগ, আর্থিক সংগতিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রান্ত দ্বারিক চৌধুরীর গ্রামসমাজে পূর্বের সম্মানহ্রাস এবং শেষত সংস্কার বিসর্জন দিয়ে কুলদেবতাবিগ্রহ - বিক্রয়, ন্যায়রত্নের

ভগ্নহৃদয়ে সুগ্রামত্যাগ, মাতব্বর বনওয়ারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহারদের রেলে-কলে চাকরিগ্রহণ, কর্তাবাবার বটগাছে কুঠারাঘাত, বাঁশবাদির বাঁশবন উচ্ছেদ এবং তার স্ত্রীর করালীর সঙ্গে অন্তর্ধান, নূতন কালের রাজনৈতিক কর্মী কপিলদেবের গুলিতে রামকৃষ্ণ - বিবেকানন্দ আদর্শে দীক্ষিত কিশোরবাবুর মৃত্যু — এ সকল ঘটনা পুরাতনের পরাজয়কেই ইঙ্গিত করছে ।

উপযোগিতাহীন স্থবির সমাজকে আঘাত হেনে বদলে দিতে নবীন চেতনাপুষ্ট কিছু মানুষের আবির্ভাব ঘটনাকে তিনি অস্বীকার করেন না । সমাজ সম্পর্কে লেখকের উক্তি —'আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতায় আমি দেখলাম তার শক্তি নাই, সে মুমূর্ষু — শক্তি তার নাই, সে সক্রিয় নয়, শুধু আয়তন এবং ভারটা একদা বিপুল ছিল বলেই ঘটোৎকচের দেহের মত সে জীবনের গতির পথ রোধ করে পড়ে আছে ।' [৮]

তিনি মনে করেন —'জীবন - অন্তত মানুষের মধ্যে প্রাণশক্তি — বিপ্লবধর্মী প্রগতিশীল ; প্রতি মুহূর্ত সে তার অতীতকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের পানে নূতন উপলব্ধির পথে চলেছে ; সে উপলব্ধি নূতন সত্যের উপলব্ধি , বৃহৎ থেকে বৃহত্তর , মহৎ থেকে মহত্তর সৎ -এর উপলব্ধি । সমাজগত জীবনে, জাতিগত জীবনে এই পথের প্রতিকূল অবস্থাগুলিকে ভেঙে অনুকূল ও সমতল করার কর্মের মধ্যে তার অভিব্যক্তি ।'[৯]

এই নূতন বৃহত্তর জীবনস্বাদের উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষায় শিবনাথ, দেবুঘোষ, সীতারাম নিরন্তর প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করেছে । আর অতীতকে অতিক্রম করতে পারেন নি বলেই ন্যায়রত্ন , দ্বারকা চৌধুরী দুঃখ পেয়েছেন । পরম - বনওয়ারীর দ্বন্দ্বে দুর্বৃত্ত পরম উন্নততর জীবননীতির (স্নেহ - বাৎসল্য, ক্ষমা, উদারতা, যৌথচেতনা) ধারক বনওয়ারীর কাছে হার মানে সমস্ত আটপৌরে পাড়া একতাবদ্ধ ও শৃঙ্খলাযুক্ত

৮। আ সা জী (১) পৃ ৪৮

৯। আ সা জী পৃ ১৭৭

বেহারা কাহারদের দলে মিশে উন্নত হতে চায় । আবার সৎসাহস [পরোপকারে বারে বারে ঝুঁকি নিতে দেখি করালীকে — যেমন কাবুলীওয়ালাকে প্রহার ; শিমুল গাছে চড়ে ঝড়ের ঘোষণা .....] আত্মবিশ্বাস ও মুক্তদৃষ্টিসম্পন্ন দুরন্ত করালীর কাছে গোঁড়া বনওয়ারীকে হেরে যেতে হয় ।

মানুষের প্রাণশক্তির বিপ্লবধর্মীর প্রগতিশীলতায় নবতর, মহত্তর সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় , একথা জেনেও উপন্যাসের কাহিনীতে তিনি সর্বদা নূতন সমাজলক্ষণকে সাদরে বরণ করতে পারেন নি । অহীন্দ্র, বিশ্বনাথের কমিউনিজমের আদর্শ ও কার্যকলাপ, করালীর বেপরোয়া আচরণ ও কাহারপাড়ার সকলকে রীতিভঙ্গ করে নূতন জীবিকা নিয়ে স্বাধীন জীবনযাপনের আহ্বান — এসব যেন যুগান্তরের অনস্বীকার্য ঘটনামাত্র । লেখক তার অতিরিক্ত কোন গুরুত্ব আরোপ করতে পারেন নি, তাই এসব চরিত্রের উজ্জ্বল সম্ভাবনা ও সাফল্যের কথা শোনাতে পারেন নি, যা পেরেছেন গান্ধীবাদী দেবুর বেলায় । এই কারণে অভিযোগ ওঠে যে, তারাশংকর ঔপন্যাসিকের অখণ্ড দৃষ্টি, পক্ষপাতহীন বিশ্লেষণক্ষমতায় সমাজ বাস্তবতাকে তুলে ধরতে পারেন নি । 'পঞ্চগ্রাম গণদেবতায় নেতিবাচনের করুণরূপ যতটা প্রকট, নতুন সমাজসত্যকে স্বীকারের তত আগ্রহ নেই ।'[১০]

তারাশংকর প্রায় সর্বত্রই ক্ষীয়মান প্রাচীনের আলোকে নবীনকে দেখেছেন । অনিরুদ্ধ , করালী পঞ্চায়েতকে , সামাজিক প্রথাকে যেসব ব্যাপারে ও যে যুক্তিতে, যে কারণে অগ্রাহ্য করে সেগুলো জানিয়েছেন সত্যি কিন্তু তাদের আচরণকে যেমন লেখক সমর্থন করতে পারেন নি । তাদের রীতিভঙ্গের সাহস ও দৃঢ়তার মূলে ভাঙার মনোভাব যেমন দেখিয়েছেন গড়ার পরিকল্পনা তেমন দেখাননি । অবশ্য অনিরুদ্ধ করালীরা যে আর্থিক দুর্দশায় ও যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের হাওয়ায় এমনটা করেছে তা যথেষ্ট ভালো করেই বলেছেন । এর বেশি সুসংহত রাজনৈতিক চেতনা সে সময়ে রাঢ়ের পল্লীর অসংগঠিত মানুষের মধ্যে বাস্তবে দেখা দেয়নি, ফলে লেখকের পক্ষে সে রকম কিছু

১০। রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত — উপন্যাস প্রসঙ্গে , ১৯৭১ তুলি কলম পৃ ২১

দেখানো সম্ভব হয়নি। এ সম্পর্কে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথাটি সঠিক মনে হয় — 'তারাশঙ্কর হয়তো সজ্ঞানে এই যুগপ্রবাহের বিরোধিতা করতে চাননি, কিন্তু তাঁর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া খানিকটা অবচেতনভাবে নতুনের নির্মমতাকেই যেন প্রধানত অভিবাদন করতে চেয়েছে।' [১১]

কালবৈশাখী ঝড়ের কেতন উড়িয়ে যে নূতন ঝড়ঝঞ্ঝার আবির্ভাব ঘোষণা করে, যার সততা ও মূল্যের পরীক্ষা ও প্রমাণ হয়নি, তারাশঙ্কর তার জয়ধ্বনি করতে পারেন নি। বস্তুত তাঁর বিপুল সাহিত্য পরিধিতে নবীনের স্থান সংকীর্ণ। একজন রাজনৈতিক কর্মী হয়ে তিনি সম্ভবতঃ লক্ষ করেছিলেন যে, ১৯২২ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে — ইটালীতে মুসোলিনীর শাসনারম্ভ থেকে জাপানের চীন আক্রমণ পর্যন্ত — ইটালী, জার্মানী ও স্পেনে জাতীয় সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার নামে অচিরেই একনায়কতন্ত্র কায়েম হয়েছে। জগতেও বিভিন্ন রাজনৈতিক সংকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনে তেমনেই আর আস্থা রাখতে পারছিলেন না। সুতরাং তখন যেকোন নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক জাগরণকে সন্দেহের চোখে দেখার ন্যায্য কারণ ছিল।

'চৈতালী ঘূর্ণি'র শেষতম বাক্যটিতে নিকট সমাগত বিপ্লবের যে পূর্বাভাস দিয়েছিলেন এবং কালিন্দীতে অরবিন্দের সাম্যবাদী উক্তি ও তার গ্রেপ্তারের ঘটনায় যে তাৎপর্য ন্যস্ত হয়েছে তাতে অনুমান করা গিয়েছিল তিনি সম্ভবত এদেশে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ও সদ্যপ্রতিষ্ঠিত সাম্যবাদী সংগঠনে আশান্বিত। অনেক পরে 'কালান্তরে'র কপিলদেব চরিত্রে সে বিশ্বাস ধ্বনিত হয়নি। বিশ্বনাথের মত কমিউনিস্ট চরিত্র সৃজন করে আঁকতে বা কোন সার্থকতা দিতে না পেরে তেমনিভাবে অকালিক মৃত্যুর সংবাদ জানিয়ে তাকে উপন্যাস থেকে সরিয়ে নিয়েছেন। কপিলদেবের ব্যক্তিত্বকে উদ্ভট ও হেয় করে দেখিয়েছেন — যে যাদের পক্ষ নিয়ে সমাজসেবা করতে যায় তারাই তাকে সন্দেহ ও অপছন্দ করে।

১১। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — বাংলা গল্প - বিচিত্রা, ১৯৫৮, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলি পৃ ১২১

এইভাবে বোঝা যায় জীবনের প্রথম দিকে কমিউনিজম সম্পর্কে আগ্রহ ও আস্থা প্রকাশ করলেও অল্পকাল পরেই তিনি তা হারিয়েছেন। কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা তাঁর সম্বন্ধে ঠিকই বুঝেছিলেন —'কম্যুনিজমকে কখনো নিজের জীবনদর্শন বলে তারাশঙ্করবাবু গ্রহণ করেননি, বরং ছিল গান্ধী-চিন্তার সঙ্গে তাঁর মর্মের সংযোগ।'[১২] এই ঔপন্যাসিকের জীবনভাবনায় গান্ধীবাদের প্রভাব বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। অসহযোগ, আইন অমান্য ও বিদেশী দ্রব্য বর্জন এবং হরিজন সেবা আন্দোলনের সঙ্গে তারাশঙ্কর সমভাবেই একাত্ম হতে পেরেছিলেন কারণ তাঁর তরুণ মনের জনসেবা ও সংগঠনকর্মপ্রেরণা যথাসময়ে একটি সর্বভারতীয় আদর্শ খুঁজে লাভ পেয়েছিল। যার প্রেরণায় তিনি সনাতন অহিংসা ন্যায়বোধ, সহিষ্ণুতা ও সেবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং ভারতীয় ধর্মীয় ঐতিহ্যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিয়ে তিনি ছিলেন একান্ত আস্তিকবাদী। রাজনৈতিক ভাবনায় তাই তিনি গান্ধীবাদকে গ্রহণ করতে পেরেছেন, ভারতীয় কমিউনিজমকে পারেন নি। তাঁর কাছে 'দলীয় মনোভাব বা সশস্ত্র বিপ্লবের নেশা বড় ছিল না, দেশপ্রেমের আবেগটাই বড় ছিল।'[১৩] আর, গান্ধীজীর আদর্শের মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন 'মানব জীবনের মৌলিক নীতিবাদের সন্ধান।'[১৪]

তারাশঙ্কর বলেছেন 'আমার মনে ভেঙে গড়ার গভীর স্বপ্ন ছিল।'[১৫] কিন্তু তিনি জানান —'বিদ্রোহ এবং বিপ্লবে প্রভেদ আছে। আমি বিদ্রোহের ছিলাম না। বর্তমানকে ভেঙেচুরে তাকে অগ্রাহ্য করে শূন্যস্থানের মধ্যে জীবনকে শেষ করার কল্পনায় আমার মনের পরিতৃপ্তি কোনদিন হয়নি।'[১৬] তাই ভারতীয় কমিউনিস্টদের নেতিবাচক দৃষ্টি ও অকারণে দেশীয় ঐতিহ্যকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করার প্রবণতা তাঁর বিরাগের কারণ হয়েছে। 'মন্বন্তরে'র কমিউনিস্ট নেতা বিজয়বাবু কিন্তু ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কোন প্রতিভূ নন। কারণ, তিনি পুণ্যফল প্রভৃতি অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী এবং মনে করেন হিংসার চেয়ে আত্মদহনে চিত্তশুদ্ধিই সত্যকে জয়যুক্ত করার যোগ্যতর কথা। মার্কসিজম্

১২। ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় — তারা হতে তাঁর ১৯৭৪ মনীষা গ্রন্থালয়, কলি, পৃ ৪৪০
১৩। তা. মা. জী. (১) পৃ ৩৩
১৪। তা. মা. জী. (১) পৃ ৩৪
১৫। তা. মা. জী. (১) পৃ ৭৭
১৬। ঐ

সম্পর্কে প্রবন্ধাদি পড়ে তারাশঙ্করের মনে হয়েছিল 'মার্কসবাদসম্মত সমাজ পরিকল্পনা পৃথিবীর হাতে একটি মহত্তম আবিষ্কার।'[১৭] তবু 'তার বস্তুবাদ - সর্বস্বতাকে মানতে' পারেন নি। Economic determinism বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং তার ঘাই যে ব্যক্তি আদর্শ ও আচরণকে, সমাজ ও রাষ্ট্রের গতি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে — মার্কসবাদের এই তত্ত্বকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা যথার্থ এবং অভিনব বলে উপলব্ধি করেছেন। 'চৈতালী ঘূর্ণি', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'ধাত্রীদেবতার উপকথা', 'পদচিহ্ন', 'তনান্তর', 'ভুবনপুরের হাটে' পর্যন্ত নগরের বিস্তার, কল-কলকারখানায় নূতন উৎপাদন পদ্ধতির মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় শ্রেণীচেতনা ও সংঘাতের সূচনা ও পরিণতির পরিবর্তে পুঁজিবাদের প্রতিপত্তিসহ সামাজিক পরিবর্তনের চিত্রে প্রকৃতপক্ষে Economic Determinism ও Dialectical Materialism -এর স্বীকৃতি আছে।

(৪) ১৯৪৩ এর ডিসেম্বরের শেষের দিকে বিনয় সরকার বলেছিলেন — 'তারাশঙ্করের রচনায় মার্কস ও নাই, সমাজতন্ত্রও নাই। যদি কিছু থাকে তা হচ্ছে রোমান্টিকতা, পল্লীনিষ্ঠার ভাবুকতা, পশুপ্রীতির ভাবালুতা।'[১৮] মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ ও বিবেচনাধীন। তারাশঙ্করের উপন্যাসে সমাজদর্শনে আংশিকতা, অপূর্ণতা প্রভৃতি ত্রুটি কিছু দেখা গেলেও পল্লীগ্রামের জীবনযাত্রা, সমস্যাদি, উন্নতিচিন্তা এবং মানবপরিচয়হীন সাধারণ মানুষের প্রতি সহমর্মিতার মনোভাবে কোথাও আন্তরিকতার অভাব ছিল একথা সত্যের অপলাপমাত্র। তাই নারায়ণ চৌধুরীকে বলতে শুনি, — 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর মানবপ্রেমের আদর্শের দুই শ্রেষ্ঠ প্রতীক।'[১৯]

১৭। তা. সা. জী (২) পৃ ১৩৩

১৮। বিনয় সরকারের বৈঠকে (২) ১৯৪৫ চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী এন্ড কোং, পৃ ২৬

১৯। নারায়ণ চৌধুরী — আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন ১৩৬৫ ভিক্টোরিয়া। পৃ ১২৬

তারাশঙ্করের সাহিত্যে রোমান্টিকতার আধিক্য এবং সেই সঙ্গে বাস্তবতার অভাব — দুটি বড় ত্রুটি হিসেবে অনেকেই নির্দেশ করে থাকেন। তাঁর রোমান্টিকতার আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে এখানে আমরা ওয়াল্টার ও পেটারের Appreciation গ্রন্থের একটি অংশ স্মরণ করব —

'It is the addition of strangeness to beauty, that constitutes the romantic character in art ; and the desire of beauty being a fixed element in every artistic organisation, it is the desire of beauty, that constitutes the romantic temper.'[২০]

পেটারের সর্বজনসমাদৃত এই সংজ্ঞায় strangeness কথায় অপরিচয় ও দূরত্বের ব্যঞ্জনা আছে। এই নৈকট্য পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে — একদিকে পাঠকের, অপরদিকে লেখকের। আমরা মনে রাখব, একটি বিষয়ের রোমান্টিক আবেদনের মাত্রা নির্ভর করে দ্রষ্টার অনুভূতি ও সংবেদনশীলতার তারতম্যের ওপর। নৈকট্য, দূরত্ব ও তো আপেক্ষিক ব্যাপার। আর পৃথিবীর যে কোন স্থানই তো কিছু মানুষের বাসভূমি ; জীবন ও জীবিকাসূত্রে তা অতি পরিচিত।

তারাশঙ্করের পল্লীনির্ভর সাহিত্য যে শহুরে পাঠকের কাছে একান্তভাবে রোমান্টিক মনে হয় তার প্রধানকারণ — পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে দূরত্বের তথা অপরিচয়ের ব্যবধান। রাঙামাটির রাঢ়ের গ্রাম, ঘরা নদী তাল ও বাঁশবনে ঘেরা গ্রামে বাউল, তান্ত্রিক সাধু, কামার, বাউরী ইত্যাদি নানাধরণের মানুষের যে বিচিত্র আবেশময়, লোকায়ত গ্রামসমাজ, জীবনপ্রবাহ নাগরিক মানুষের দৈনন্দিন গতানুগতিক জীবনপ্রভাবিত চেতনায় তা কিছু প্রবল রোমান্টিকতা সঞ্চার করে। তার ভিত্তিতে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির রোমান্স নয়ন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা উচিত নয়। সমতলবাসীর

২০। W.H.Pater - Appreciation (Postscript) 1957
Oxford University Press. P.66

কাছে দূরের পাহাড় মোহময় নীল প্রতীয়মান হলেও সেই পাহাড়ের বাসিন্দাদের সুখদুঃখ ও বিশিষ্ট সুবিধা অসুবিধাময় জীবনের বাস্তবতা কিছুমাত্র লঘু ও অর্থময় হয়ে ওঠে না। এক্ষেত্রে বিশেষভাবেই এ তুলনার কথা মনে আসে কারণ, তারাশঙ্কর যে পটভূমি নিয়ে লিখেছেন তিনি লেখানকারই মানুষ, যাদের কাহিনী শুনিয়েছেন, তিনি তাদেরই একজন। এইসব কারণে আলোচ্য বিষয়টি ভিন্ন দিক থেকে পরীক্ষা করা দরকার। বিশেষজ্ঞদের মতে ——

'The Romantic spirit can be defined as an accentuated predominance of emotional life, provoked for or directed by the exercise of imaginative vision, and in its form stimulating or directing such exercise.' ২১

কোন সাহিত্যসৃষ্টিতে রোমান্টিকতার ঔচিত্যনির্ণয়ে তাতে বহির্গত ও বস্তুসত্যকে অস্বীকার ক'রে লেখক বর্ণময় সৌন্দর্য ও রহস্যের মায়াসৃজন - প্রচেষ্টায় কল্পনার অতিপ্রাধান্য বিস্তার করেছেন কিনা সেটিই মুখ্য বিবেচ্য। রিয়ালিজম সম্বন্ধে জি. এস. ফ্রেজারের বক্তব্যটি স্মরণীয় —— ' it is hard to define it by outward characteristics. We might say it is the opposite of evasion.' ২২

আপন রচনার প্রেরণা ও উৎস বিষয়ে তারাশঙ্করের স্বীকারোক্তি :
'বাস্তবতাই আমাকে লেখার জীবন্ত উপাদান যুগিয়েছে। তা থেকেই আমি প্রেরণা পেয়েছি। * * * জীবনের দেখা মানুষ, চরিত্র ধরেই গল্প বেশী এসেছে এবং সেই চরিত্রের নিজের পরিণামের মধ্যে গল্পটি সুন্দর পরিণতি পেয়ে সত্য হয়ে উঠেছে।' ২৩

২১। Legovis and Cazamian - A History of English Literature. 1954. J.M.Dent & Sons Ltd, London P.997

২২। G.S.Fraser - The Modern Writer and his world. = 1961 Rupa Co. Cal. P.19

২৩। 'পাঠক সজ্জন ও সম্পাদক সমীপেষু', উদ্ধৃত ১৩ চৈত্র ১৩৭৬

তাঁর সৃষ্ট বিভিন্ন প্রকার চরিত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের কথা জানিয়ে স্মৃতিকথায় বলেছেন ——

'আমার সাহিত্যিক জীবনে এরা দলবেঁধে ভিড় করে এসেছে ঠিক এই কারণেই। • • • বিষয়বৈচিত্র্যের জন্য আমি এদের খুঁজে পেতে যাই নি।' [২৪] 'আমার উপন্যাস'র অতি অস্বাভাবিক চরিত্র পানু সম্পর্কে তিনি উপন্যাসটিতে জানিয়েছেন 'বিচিত্র পানু। সমাজের একরঙা পটভূমিতে সে কালোর বুকে লাল, অথবা লালের বুকে কালো বিন্দুর মত বিষয়ধর্মী বৈচিত্র্যের বিন্দু। সে সাধারণ নয়, তবুও সে বাস্তব, সে আছে।' [২৫] উদ্ধৃত শেষ বাক্যটি রোমান্টিকতার অপবাদের বিরুদ্ধে তাঁর বৈফিয়ৎ হিসেবে গ্রহণ করা চলে।

আমাদের আলোচ্য সৃষ্টিমালার ভিত্তিতে তাঁকে শুধু অতি - রোমান্টিক বলে বর্ণনা করলে তাঁর অভিজ্ঞতার অপমৃত্যুকেই স্বীকার করা হয়। 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা', 'পদচিহ্ন'র পাতায় পাতায় তিনি সমাজসত্যকে ধরে রেখেছেন। ফ্যাসিস্টের প্রভাব, পল্লীসমাজে কথনের শিথিলতা, উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের সুদূর প্রতিক্রিয়ায় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের রূপান্তর, মালিকশ্রেণীর সঙ্গে ব্যবসায়ীর বিরোধ ও শেষোক্তের জন্ম ও তার সামাজিক তাৎপর্য, ঐতিহ্যের অবলুপ্তি ইত্যাদি বহু বিষয় তাঁর উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয়। বাস্তবতাবোধ চালিত বলেই তারাশঙ্কর বর্তমানের খুঁটিনাটি বর্ণনাদানেই ক্ষান্ত হতে পারেন না, সামগ্রিকতার প্রয়োজনে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সুসংহত করেন।

কিন্তু তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত বাস্তবতা প্রশ্নাতীত ও ত্রুটিমুক্ত নয়। অভিজ্ঞতা, স্মৃতি, কল্পনা ও মনন যোগে উপলব্ধ সত্যকে ঔপন্যাসিক যখন নির্বাচিত কাহিনী, বিষয়, ভাষা ইত্যাদি র উপাদানে প্রকাশ করেন তখন তাঁকে সমস্যার দিকে

২৪। আমার কালের কথা (৬ ষ্ঠ পরিচ্ছেদ), মনের অগোচরে, ১৩৮৩ সাহিত্যশ্রী, কলি, পৃ ৭৫

২৫। রচনাবলী (১২) পৃ ১৩২

লক্ষ্য রাখতে হয় । রচনায় যে জীবনচিত্র ও সংকটের মধ্য থেকে তিনি জীবনসত্যের সন্ধান করবেন তার পূর্ণরূপ অর্থাৎ ভালমন্দ আলোচ্য আঁধার সবটুকুই, দেখানো প্রয়োজন । তারাশংকরের সমাজচিত্র অনেক সময় আংশিকতাদুষ্ট । তাঁর অনুক্ত সিদ্ধান্ত কোন কোন সময় উপন্যাসের কার্যকারণ থেকে উদ্ভূত নয় আরোপিত । তাই পাঠকের কিছু প্রশ্ন উপন্যাস পাঠশেষে থেকেই যায় । দেবু ঘোষ দেবতা নয়, পল্লীসমাজেরই মানুষ । তার অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতাও বেশি নয় । তবু জগন ডাক্তার বা অন্যান্যদের সঙ্গে সে কেন সাক্ষততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ না দিয়ে ধর্মঘটের বিরুদ্ধতা করে বা সমাজের কাছে বারে বারে আঘাত পেয়েও কেন তার দৃষ্টি ও আচরণ বদলায় না তার ব্যাখ্যা নেই ।

'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় যন্ত্রশিল্পের অনুপ্রবেশ ও প্রজাসাধারণের উপর তার প্রভাব প্রদর্শিত হয়েছে শিল্পের ক্ষেত্রে শোষণ প্রত্যক্ষ এবং নিলর্জ , ব্যক্তি সেখানে শ্রমিক অর্থাৎ উপাদানের একটি উপাদান মাত্র — এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' লক্ষ্য করলে ধরা যায় । কিন্তু শিল্পের প্রসারে ভূমিহীন চাষী যে নির্দিষ্ট নিয়মিত আয়ের পথ খুঁজে পেল, আর পেল সংগঠন ও প্রতিবাদের অধিকার তা অনেক ক্ষেত্রেই দেখাবার প্রয়োজন বোধ করেন নি । অবশ্য 'চৈতালী ঘূর্ণি', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' শিল্প ও কৃষির তুলনার অবতারণা বাস্তব যুক্তির ভিত্তিতেই করেছেন' যদিও কাহারদের সংস্কারাবদ্ধ ঘনোভঙ্গির আশ্রয় অপরিহার্য ছিল তবু করালীর উক্তিতে চাষীর দুর্দশা ও শাসন, কাহারদের সংস্কার থেকে মুক্ত হয় কিসের তাড়নায় ? সীতারাম পিতার অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে শিক্ষকতায় আগ্রহী হয় কোন প্রবলতর আকর্ষণে তার যথাযথ বিবরণ নেই'সন্দীপণ পাঠশালা'য় আবার, যন্ত্রশিল্পের অবধারিত প্রসার ও সুখী পল্লীসমাজ দেখে'পঞ্চগ্রামে'র শেষে দেবুর যে উচ্ছ্বাস তার সঙ্গে পূর্বাপর ঘটনার সামঞ্জস্য কোথায় ? দেবুর মত জনদরদী কর্মীর অবর্তমানে রিক্ত , দরিদ্র, লাঞ্ছিত, ভীত ও ঐ একতাহীন পল্লীবাসীকে সুখ সমৃদ্ধিকে এনে দিল বা কোন পথে সৌভাগ্যেরউদয় হ'ল তা ঐ অংশে জানা যায় না । তাই দেবুর কল্পনা সুখস্বপ্ন বা Utopia —মাত্র, লেখকের রোমান্টিকতার একটি দৃষ্টান্তস্থল ।

এখানে দু একটি দৃষ্টান্তযোগে লক্ষ্য করা গেল যে তারাশঙ্কর শুধু Formal Realism বা তথ্যগত বাস্তবতা আনেন নি, উপরন্তু তাঁর মধ্যে Realism এর ধর্মও এসেছে। স্থানবিশেষে তাঁর বিশ্লেষণের ভুল বা অরসিকতা স্বীকার করেও একথা মানতে পারি না যে —'তিনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাস্তববাদী হলেও সামগ্রিক বিচারে বাস্তববাদী নন, এবং সমাজ বাস্তবতার কথাটার প্রয়োগ তাঁর ক্ষেত্রে আতিশয্য ছাড়া আর কিছু নয়।'[২৬] কোন কোন বামপন্থী সাহিত্যিকও একদা তারাশঙ্করের সাহিত্যকে বাস্তবধর্মী বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নূতন সংযোজন বলে অভিহিত প্রশংসা জানিয়ে বলেছিলেন —'আমাদের বাংলা কথাসাহিত্যের দিকে তাকালে দেখা যাবে কিছুদিন হল এখানেও লেখকরা বস্তুনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছেন। * * * কিন্তু এই 'অতি স্বাভাবিকতা' স্তর পেরিয়ে যে সামাজিক বাস্তবতা বোধ ঘটনার বহিরাবয়ব নয়, তার অন্তর্নিহিত সামাজিক সত্য উদ্ঘাটনের স্তর আমলতার লক্ষণও ক্রমে পরিস্ফুট হচ্ছে। তারাশঙ্করের Regional novel বা আঞ্চলিক উপন্যাস, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন ধরণের ছোট গল্প, সতীনাথ ভাদুড়ীর সাম্প্রতিক উপন্যাসের উদ্ভব, বিমল ভট্টাচার্যের গণনাট্য সৃষ্টিই এখন পর্যন্ত এই ধারার সার্থকতম প্রয়াস।'[২৭] সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসে কালচেতনার যুগপ্রয়োগে তারাশঙ্করকে 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অদ্বিতীয়' বলেন এবং তাঁর 'সমাজবাস্তবতার সার্থক ব্যবহারে'র প্রশংসা করেন।[২৮] কার্তিক লাহিড়ী তারাশঙ্করের উপন্যাস সাধারণভাবে যথাযথবাদ - অনুসারী, স্থান - বিশেষে বাস্তববাদের কাছাকাছি ব'লে মনে করেন।[২৯]

তবু বিনয় সরকারের মত কোন কোন সমালোচকের কাছে তাঁর সাহিত্য একান্ত রোমান্টিক প্রতিভাত হওয়ার কিছু কারণ আছে। রসকলি, রাইকমল, কবি,

---

২৬। দীপেন্দু চক্রবর্তী —'তারাশঙ্করের সমাজচেতনা ও তাঁর সাক্ষ্য' উজ্জ্বল কুমার মজুমদার সম্পাদিত তারাশঙ্কর : দেশ, কাল সাহিত্য ১৩৮৪ মডার্ণ বুক এ· কলি পৃ ২৫

২৭। চিন্মোহন সেহানবীশ —'সাহিত্য ও সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা', পরিচয় মাঘ ১৩৫৩

২৮। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, পৃ ২৯৩

২৯(ক) কার্তিক লাহিড়ী —'বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস' ১৯৭৭, সারস্বত লাইব্রেরী, কলি· পৃ ৭১ - ৭২

(খ) ,, ,, —'বাস্তববোধ, আঞ্চলিকতা ও বাংলা উপন্যাস', মহানগর, জুন ১৯৮২

রাধা, নাগিনী কন্যার কাহিনী , হাঁসুলী বাঁকের উপকথা ইত্যাদি রচনায় বিচিত্র আবেগে ও পরিবেশে প্রেমের লীলায়িত প্রকাশ, ঈর্ষা ও চঞ্চলতা , শহর থেকে দূরে অতিলৌকিক পরিবেশে প্রকৃতির মত প্রায় - আদিম মানুষের প্রথা সংস্কার বিশ্বাসময় অদেখা জীবনযাত্রার কাহিনী সাধারণ পাঠকের মনে রোমান্টি প্রভাব বিস্তার করে। লেখকের বিশেষ প্রচেষ্টা ব্যতীতই এই সকল বিষয়বস্তু ও তদুপযোগী বর্ণনা পাঠক মনে কাম্যিক পরিমন্ডল সৃষ্টি করা সম্ভব। উল্লিখিত রচনাগুলি নিরলংকরণেই যে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার পক্ষে যথেষ্ট। 'নাগিনীকন্যার কাহিনী'তে রোমান্সের তা বোধ হয় সমুদয় পাঠকচিত্তে রোমান্সের কিছু অতিশয্য থাকলেও তার ভিন্ন স্বাদের জন্য তা সমতিপূর্ণ হয়েছে। তাই মনে রাখতে হবে তাঁর গল্পের নরনারী ও তাদের লীলাক্ষেত্র অপরিচয় ও দূরত্বের রহস্যে রোমান্টিক গুণসম্পন্ন হলেও তারা অলীক , ভাবজগতের বাসিন্দা নয়, রক্তমাংসের মানুষ। লেখক তাদের সেইভাবেই দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে কথ রোমান্টিক তারাশংকর তা নন। তবে নাগরিক মানুষ শতাব্দীর প্রথমভাগে দীনদুর্বল অনুন্নতের মানুষের প্রতি যে নূতন সহানুভূতি ও দরদ অনুভব করতে শুরু করেছিল তা কতকটা রোমান্টিক মানসের পরিচয় দিত। সেই কারণে কারো কাছে হয়তো তারাশংকরের রচনায় সাধারণ মানুষের কথা ও তাদের প্রতি সমবেদনা অনাবশ্যক রোমান্টিকতা বলে মনে হয়েছিল। ঔপন্যাসিক কল্পনারের সমাজচেতনার বাস্তবভূমি সম্পর্কে ক্লিনথ ব্রুকস্ বলেছেন —

'His mythical country provided him with a social context in which what was healthiest in his romanticism could live in fruitful tension with his reatistic and detailed knowledge of the men and manners of his own land.' ৩০

তারাশংকরের ক্ষেত্রেও বাস্তবতা ও রোমান্টিকতার সুসমন্বয়সাধনে রাঢ়ের বৈচিত্র্যবহুল সামাজিক পরিবেশ সহায়ক হয়েছে। এই অঞ্চলের প্রতি তাঁর মনোভাবটিও

৩০। Cleanth Brooks - William Faulkner Toward Yoknapatawpha Country and Beyond. 1978 New Haven & Yale University Press, London. P XI

লক্ষণীয়। আর্নল্ড বেনেটের উপন্যাসে পটারী শহরের জীবন আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে সার্বজনীন অনুভূতি সামান্যই সৃষ্টি করে। এই কারণে ওয়াল্টার আলেন তাঁকে ' minor master' বলেছেন'।[৩১] তুলনায় তাঁর' Absalom, Absalom' 'The Sound and the Fury' 'Sartoris', 'As I Lay Dying','Sanctuary' উপন্যাসে ইওক্নাপাটাওফার সমাজজীবনকে বিশ্বমানবপ্রকৃতি ও সমকালীন জগতের সম্প্রসারিত করে দেখিয়েছেন। টমাস হার্ডির কাছে ওয়েসেক্স্ বিশ্বজগতেরই এক সীমায়িত রূপ, এখানেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন নিয়তির নিষ্ঠুর লীলা ও মানুষের দুঃখভোগ। রাঢ়ের সমাজ ও জীবনকে তারাশঙ্কর একান্ত খণ্ডিত দৃষ্টিতে দেখতে চাননি, এর মধ্যে চিনতে চেয়েছেন মানুষের প্রবৃত্তি ও আত্মবেদনার স্বরূপ। দেশকালাতীত মানুষকে খর্ব করে অঞ্চলকে অতিপ্রাধান্য দান, বাহিরের জগতের সঙ্গে তুলনায় অঞ্চলের প্রশংসা বা নিন্দা করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়।

(৫) তারাশঙ্করের ধর্মচেতনা ও অধ্যাত্মজীবনা ধর্মগ্রন্থ বা দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নলব্ধ নয় — আত্মজীবনীতেও এর বিশেষভাবেই পারিবারিক পরিবেশ এবং রাঢ় -এর ধর্মীয় পরিমণ্ডল - প্রভাবিত। তাঁরা শুধু তন্ত্রধর্মে শাক্ত অন্তিক ছিলেন না তা নয় তারাশঙ্করের বাবা তন্ত্রসাধক ছিলেন, বাড়ীতে কালী ও তারা এই দুই মহাবিদ্যার পূজা হত। রাঢ় অঞ্চলের গ্রামে তীর্থে ঘুরে ধর্মীয় জীবনের যে পরিচয় পেয়েছিলেন তার আচরণগত রূপ বহুতর হলেও তারগত আদর্শ ছিল মূলত দুটি। তিনি তাঁর সমকালীন রাঢ়ের ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে বলেছেন —'মোটামুটিই ধরা যাক তার অতি মূলভাবেই বিচার করা যাক — ধর্মজীবনে ছিল দুটি পথ বা মত — শাক্ত ও বৈষ্ণব।'[৩২] তারাশঙ্কর এই দুই সম্প্রদায়কেই তাঁর সাহিত্যে গুরুত্ব সহকারে চিত্রিত করেছেন। এতে বোঝা যায় উভয়ের প্রতিই তাঁর আকর্ষণ তীব্র ছিল। মানুষের

৩১। Walter Allen - Arnold Bennett. 1948. Home & Van Thal Ltd, London. P 43

৩২। (আ.কা. ক) মনের আয়নায় পৃ ৫৭

জীবনাদর্শের ক্ষেত্রেও শক্ত ও বৈষ্ণব ভাবের অস্তিত্ব ও মিশ্রণ লক্ষ করেছিলেন। 'সাহিত্যের সত্য' [৩৩] প্রবন্ধে তারাশঙ্কর জীবনে ও সাহিত্যে সুন্দর, শোভন, ললিত, সুকুমার বৃত্তি ও প্রসাদগুণচর্চাকে বৈষ্ণবতা এবং রক্ত মাংস রস কস্তা ক্লেদ গ্লানি মোহে রৌদ্র-বীভৎস ভয়ানক রসের মাধ্যমে সত্যের সন্ধানকে তান্ত্রিকতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। বীরভূমের প্রকৃতিতে, মানুষের জৈবলিপ্সায় যে দ্বৈত রূপের পরিচয় তারাশঙ্করের রচনায় পাই তার সঙ্গে তাঁর জীবনদর্শনের কথিত দুটি প্রধান দৃষ্টিকোণের সাদৃশ্য আছে।

এ-কথাতে শাক্ত লক্ষণ তাঁর কন্যাগত হওয়াই স্বাভাবিক। শিবনাথ শিমিমা, ইন্দ্রনাথ, বিশুদ্ধর রায় প্রভৃতি জমিদার চরিত্রে তারাশঙ্করের নিজস্ব অবানুভূতি যে অনেকটা স্থান পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এদের ভাবনায় ও কর্মকলাপে যে অনমনীয় বলিষ্ঠ সংগ্রামী মনোভাব তা লেখকেরই শাক্ত আদর্শের প্রতিফলন বলা যায়। গাড়ে মাত পঞ্চার জমিদারের মত, 'ধাত্রীদেবতার'র শিমিমা এবং নিজের শিমিমার মত তারাশঙ্করও নিশ্চয়, বীরভূমের অন্যান্য জমিদারদের মধ্যে স্থিতির জমিদারী রক্ষায় অনুভব করতেন 'মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের।' তান্ত্রিক গোষ্ঠী রহস্যময় অলৌকিক শক্তি আয়ত্ত করার প্রয়াসে অভিচার, শবসাধনা প্রভৃতি বীভৎসতার মধ্যেও এমনই কৌতূহলী, অনুভূতিহীন ও অনুদ্বেগ্য।

জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন —'তারাশঙ্করের তারাদাসী জীবনের বিভীষণা নগ্নিকা কালিকামূর্তি।' [৩৪] 'ছলনাময়ী', 'নারী ও নাগিনী', 'দেবতার ব্যাধি', 'ডাইনী', 'অগ্রদানী' প্রভৃতি গল্পে' কালিন্দী', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে তিনি মানুষের প্রবৃত্তির বিচিত্র গতিপ্রকৃতি অনুসরণে জীবনের সত্যকে চিনতে চেয়েছেন। অনুচ্চিত, নির্বিকার বস্তুলীন' এ দৃষ্টি মুখ্যতঃ কবিদৃষ্টি নয়;

৩৩। সাহিত্যের সত্য। নিশিকা। পৃ ৫৫ - ৫৮

৩৪। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প ১৩৮৩ বেঙ্গল পাবলিশার্স কলি।
ভূমিকা — পৃ ৮

এ দৃষ্টি হৃদয়াবেগবর্জিত, বৈজ্ঞানিক তান্ত্রিকের দৃষ্টি।'[৩৫] এসব রচনায় চরিত্রবৈশিষ্ট্য, কাহিনীবর্ণনা ও মন্তব্যাদিতে দার্ঢ্য, কাঠিন্য, দৃপ্ততা, অনেকস্থানে দ্বিধাসংকোচহীন নগ্নতায় লেখকের তান্ত্রিকসুলভ শাক্ত মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। রামজী সাধু ও অন্যান্য শাক্ত সন্ন্যাসীর সান্নিধ্য তারাশংকর ছোটবেলা থেকেই পেয়েছিলেন। নিজেও কয়েকবার কিছুকাল উদাসীনভাবে পথে, মাঠে, শ্মশানে বিচরণ করেছেন। এক বৈরাগ্যময় অধ্যাত্ম - পিপাসা তাঁর অন্তর্মনে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ভাবনা জাগাত। সেই অধ্যাত্মজিজ্ঞাসার বড় এক অংশ তাঁর মৃত্যুচিন্তা। 'আরোগ্য নিকেতনে' মৃত্যুরহস্য — উপলব্ধিতে যে নৈর্ব্যক্তিকতা ও ভয়লেশহীন একাগ্র অনুসন্ধিৎসা তার সঙ্গে যুগপৎ রুক্ষ রাঢ় প্রকৃতি ও তন্ময় শাক্ত সাধকের সাদৃশ্য সুগভীর। তার থেকে 'সন্ধ্যামণি' গল্পে, 'বিচারক' উপন্যাসের প্রশান্ত বৈরাগ্যযুক্ত মানসিকতার উৎস খুব দূরে নয়।

বৈষ্ণব, বাউল, সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধনগত সূক্ষ্ম পার্থক্য সত্ত্বেও লেখক গল্প উপন্যাসে সাধারণভাবে এদের সকলকেই বৈষ্ণবপন্থী বলে গ্রহণ করেছেন। 'রাইকমল', 'স্বর্গমর্ত্য', 'রাধা' উপন্যাসে 'রসকলি', 'হারানোসুর' ইত্যাদি গল্পে প্রেম-বিলসিত বৈষ্ণব জীবনের মধুর রসের আস্বাদ দিয়েছেন। এসব রচনায় 'নিকষিত হেম' তুল্য অতীন্দ্রিয় প্রেম নয় — দেহকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে প্রেমের গুরুত্ব পরীক্ষা ক'রে লেখক এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন যে — প্রেমবিরহিত, আচারসর্বস্ব ধর্মসাধনা, বা ভিন্নতর আদর্শ নিষ্ফল, অর্থহীন এবং কোন ক্ষেত্রে ভণ্ডামির নামান্তর। 'রাইকমলে'র অঞ্জন 'স্বর্গমর্ত'র নরোত্তমদাসের চরিত্রের প্রেমহীন ~~ছলনা~~ ছলনা ও কপটাচার পাঠকের কাছে তাদের হেয় করেছে। তাদের বিপরীতে কমলিনী ও ব্রজদাসীর প্রকৃতপ্রেম বঞ্চনা ও আঘাত পেয়েও ক্লেশ স্বীকার ও সহিষ্ণু আচরণ পাঠকের প্রশংসা পায়। 'রাধা' উপন্যাসে যে মাধবানন্দ একদা মোহিনীকে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তিনিই দীর্ঘকাল পরে প্রেমস্পর্শশূন্য ধর্মসাধনায় পূর্ণ তৃপ্তি না পেয়ে মোহিনীর অকপট প্রেম সাগ্রহে কামনা করেছেন। আর সেই প্রেমকে পাথেয় করে জীবনসাধনায় নূতন সম্ভাবনা

৩৫। মোহিতলাল মজুমদার —'তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'কবি' উপন্যাস', সাহিত্য-বিতান, ১৩৬৮ বিদ্যাদয় লাইব্রেরী, কলি, পৃ ২৩৩

পরিকল্পনা করেছেন। দয়িতকে অবলম্বন করে জীবন চরিতার্থতায় বাধা, ব্যর্থতা, বেদনায় কমল, ব্রজদালী, মোহিনীকে দীর্ঘস্থায়ী হতাশা ও শূন্যতাবোধে পীড়িত হতে দেখিনা। বরং মনে হয় সপ্রেম আধ্যাত্মিকতায় তারা শান্তি লাভ করেছে — এটা একপ্রকার আত্মিক জয়। 'কবি'তে প্রেমকে জীবনের এক অমূল্য সম্পদরূপে দেখানো হয়েছে। ঝুমুর দলের দেহোপজীবিনী বসন আত্মগ্লানি ও কুটীল ব্যাধিতে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল। নিতাইয়ের স্বার্থলেশহীন প্রেমের বিশল্যকরণী তার চেতনায় আশা উদ্দীপনা ও জীবনতৃষ্ণা সঞ্চয় করেছে। প্রেম - পরশমণির স্পর্শে, অন্তরের এই সঞ্চয়ে দেহের অশুচিতা, পরিবেশের গ্লানি, কৃতকর্মের পাপ তুচ্ছ হয়ে জীবন আনন্দময় ও সার্থক হয়ে ওঠে — লেখকের এই বোধ বসন্ত ও নিতাইয়ের প্রেমচিত্রণে প্রকাশিত। বিশুদ্ধ প্রেমই নিতাই ও বসনের সকল দীনতা - কালিমা সর্বাংশে শোধিত করে পাঠক হৃদয়ে তাদের মহান করে তুলেছে। 'রাইকমল', 'স্বর্গমর্ত', 'রাধা', 'কবি' প্রভৃতি রচনার সমাপ্তিতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে ও লেখকের বিশ্লেষণে যে বৈরাগ্যময় প্রশান্ত দূর্ণতার সংবেদনা সৃষ্টি হয়েছে তাতে মনে হয় তারাশংকর নিজেও স্নিগ্ধ মধুর বৈষ্ণব জীবনাদর্শের আশ্রয়ে তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছেন।

তাঁর অধ্যাত্মচিন্তার বিস্তৃত - পরিচয় গ্রহণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক। লেখকের বিচরণক্ষেত্র তীর্থময় রাঢ়ভূমি কেমন করে তাঁর জীবনদৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছে তার সামান্য পরিচয় গ্রহণ করা হল। রাঢ়ের ধর্মীয় পটভূমি স্মরণ করলে তাঁর মনে দুই বিপরীত প্রকৃতির ভাবাদর্শের সহাবস্থানের কারণটি কিছু বোঝা যায়। প্রমথ নাথ বিশী তারাশংকরমানসের এই বৈশিষ্ট্য বোঝাতে বলেছেন —'যেখানে তিনি চিন্তাশীল সামাজিক মানুষ সেখানে শক্তিভাবের প্রেরণা, সেখানে তিনি হৃদয়াবেগে পরিচালিত, একক, সেখানে তিনি বৈষ্ণব।'[৩৬] এই কারণেই তিনি রোমান্টি আত্মত্যাগ ও ঐতিহ্যানুগামী আদর্শের আকর্ষণে গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের অনুরাগী আবার মুক্তদৃষ্টি বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় ও যৌবনের প্রতিমূর্তি সুভাষচন্দ্রের ভক্ত।

৩৬। রচনাবলী (১) ভূমিকা পৃ ১৬

(৬) তারাশংকরের রচনায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা ভিন্নতর চেতনা যে পরিমাণেই প্রকাশিত হোক, তাতে অসঙ্গতি অর্পূণতার প্রশ্ন থাকলেও, কথাসাহিত্যে তিনি মূলতঃ একজন জীবনরসিক, মনুষ্যজীবনের অপার রহস্যের বিমুগ্ধ দ্রষ্টা। মানুষের মনের জটিলতার অতলে অবগাহন করে তার মানবীয় সত্তার স্বরূপটি অনুধাবণ করার চেষ্টা করেছেন। আর বিভিন্ন স্তরের স্বভাবের, জীবিকার মানুষের মধ্যে তিনি প্রধানতঃ লক্ষ্য করেছেন এক আদিমতম বৃত্তির অস্তিত্ব ও সক্রিয়তা।

সাহিত্যক্ষেত্রে প্রকৃত আত্মপ্রকাশের কালেই তারাশংকর তাঁর অভিজ্ঞতার জগতে প্রবৃত্তি তাড়িত মানুষের জীবনরহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন এবং সাহিত্যে সেই পরিচয়ের স্বাদ পরিবেশনযোগ্য বিবেচনা করেছিলেন। ১৩৩৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'কালিকলম'এ প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট' পেরিয়ে' ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'বেনামী বন্দর : জনি ও টনি' গল্প দুটি পাঠকালে এই কারণেই তার মন বিচিত্র বিস্ময়পূর্ণ রসমাদকতায় মদির হয়েছিল, মনে হয়েছিল 'অদ্ভুত'; উভয় গল্পে অন্তর্লীণ জৈবিক আবেগ লক্ষ্য করে খুশি হয়েছিলেন।[৩৭] রক্তমাংসের মানুষের জৈবিক আবেগ ও কামনা বা passion এর বহুবিচিত্র গতিপ্রকৃতি তাঁর গল্প উপন্যাসের অসংখ্য চরিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। জগদীশ ভট্টাচার্য বলেন, তারাশংকরের সাহিত্যে 'মানুষের ধাতু-প্রবৃত্তিরই দুর্দমনীয় বিকাশ। তাই তাঁর রচনায় মধুর ও করুণ রসের সঙ্গে রৌদ্র, ভয়ানক এমন কি বীভৎস সমান মর্যাদা পেয়েছে।'[৩৮] আত্মরক্ষা, যৌনক্ষুধা, শোক, বাৎসল্য প্রভৃতি যে সব মৌলিক প্রবৃত্তি মনুষ্যদেহের অবিচ্ছেদ্য উপাদানরূপে তার স্বভাব গঠন করে ও বিবিধ কর্মে চালিত করে তারাশংকর সে সব প্রাকৃত প্রবৃত্তির প্রবল, অনাবৃত ও বিচিত্র গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করে মনুষ্যজীবনের অনন্ত রহস্য উপলব্ধি করতে চেয়েছেন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রকে সামনে রেখে। শরৎচন্দ্রও মিস্ত্রী, গুণ্ডা, পতিতা, মাতাল, দালাল,

---

৩৭। আ. সা. জী. (১) পৃ ১৯ - ২০

৩৮। শ্রেষ্ঠ গল্প, ভূমিকা — পৃ ৮

বাউন্ডুলে ভবঘুরে শ্রেণীর মানুষের সান্নিধ্যে এসেছেন। কিন্তু সেসকল অভিজ্ঞতা তৎকালে মানুষের জৈবিক আচরণকে বিশেষ প্রাধান্য দেননি; চুয়ুন বর্ণনাতেও তিনি কুণ্ঠিত। আপ, কৃচ্ছসাধন প্রভৃতি আদর্শ ও মৃদুমভাবের দিকটিই দেখাতে চেয়েছেন। তারাশঙ্কর ভাল, মন্দ, ন্যায়, অন্যায়, যুক্তির আলোকে নয় শুধু অতীন্দ্রিয় ভাবগত সৌন্দর্য আরোপ করে নয়, যথাযথ অবস্থায় জীবদেহ — সরোবরে প্রবৃত্তি - কৃত্ত জীবনপুষ্পের নব নব প্রকাশ প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন। অভিজাত, অনভিজাত, শাক্ত বৈষ্ণব ইত্যাদি তাঁর অঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের আচরণে প্রবৃত্তির যে প্রকাশ তিনি দেখেছেন তা কখনও কোমল, কখনও উগ্র, কোথাও শান্ত, কোথাও বিক্ষুব্ধ। 'রসকলি' গল্পে পুলিন ও ফকরীর দেহবাসনা কিছু পরিমার্জিত কিন্তু 'রাইকমলে' তা প্রবল ও স্পষ্ট। 'দেবতার ব্যাধি'তে ডাক্তার গড়গড়ি দেহজ কামনার কাছে আত্মসমর্পণ করেন, আর 'জলসাঘর' গল্পের বিশ্বম্ভর রায় চরিত্রে একই সঙ্গে প্রচণ্ড অহংকার, ভোগবাসনা ও নিষ্ফল আক্রোশের অভিব্যক্তি দেখা যায়। 'আগুন' উপন্যাসে হীরু তীব্র কামনায় বহু নারীসঙ্গলাভে তৎপর আর চন্দ্রনাথের মধ্যে দেখি ধনী ও বড় হবার, বিরাট কিছু করার আপাদমস্তক অস্থিরতা। 'পৌষলক্ষ্মী'তে চাষী মুকুন্দ পান পঁয়ষট্টি বছর বয়সে তারাকে অস্বীকার করার চেষ্টায়, মদ্যপান করে জোয়ানদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কৃষিকর্ম করে আর 'তামস তপস্যা'য় প্রচুর প্রাণশক্তির দাপটে সরল কিন্তু পৌঁয়ার পাণু মুরুত পশুর মত আচরণ করে, স্থান থেকে স্থানান্তরে চলে তার অস্থির শক্তিসন্ধান।

অনেক প্রাবন্ধিক তারাশঙ্করের রচনায় অভিজাত চরিত্রে 'আদিম প্রাণপ্রবাহ' ও দেহজ কামনায় 'আন্তরিকতা'র 'সুন্দর নিদর্শন' হিসাবে যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন আলোচ্য প্রসঙ্গে সেটি পরীক্ষা করা যেতে পারে। জমিদারীর ব্যাপারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়, দেহমনে অস্থির শিবনাথ একদিন তার স্ত্রী গৌরীর শারীর - সান্নিধ্য সম্ভাবনায় উৎসাহিত হল। সমালোচকের মতে — সেই চিন্তা, 'আদিম দেহচেতনা' অভিজাত ও আদর্শবাদী শিবনাথকে 'পুরণো প্রাচীন মাটির জগতের মধ্যে নিয়ে গেল। সবচেয়ে বড়ো কথা, আদর্শবাদী শিবনাথ এবং দেহ-চেতন শিবনাথ — এই দুই শিবনাথের মধ্যে

দ্বন্দ্ব না আসা । এই নির্দ্বন্দ্ব অবস্থাই তার মনের আদিমতা ও সারল্যের সূচক ।'[৩৯] বক্তব্যটি যুক্তিগ্রাহ্য নয় । অভিজাত , পরিশীলিত মানুষও যে যৌনানুভূতির অধীন একথা আমাদের বলার অপেক্ষা রাখে না । সেক্ষেত্রে উচ্চাদর্শে ভাবিত ব্যক্তিও যে সাময়িকভাবে যুবতী স্ত্রীর (তা, সে স্বার্থপর ও নিম্ন মানসিকতার হলেও) সঙ্গ কামনা করবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই । সুতরাং আদর্শ ও এই সমাজস্বীকৃত দেহচেতনার দ্বন্দ্বে প্রশ্ন ওঠে না ।

আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি রাঢ়ের আনাচে কানাচে থাকা বহুতর মানুষের সম্পর্কে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁকে এইপ্রকার জীবনরহস্যের সন্ধানদানে উৎসুক করেছিল । তাই, স্বাভাবিকভাবেই তান্ত্রিক, বাউল, বৈষ্ণব - বৈষ্ণবী , সাপুড়ে বেদে, ঠ্যাঙারে, ডাকাত, নিরক্ষর চাষী প্রভৃতি অ-সামাজিক , ও ভদ্রেতর মানুষের মধ্যে এই অমার্জিত প্রাণলীলা যেমন দেখাবার সুযোগ পেয়েছেন অভিজাত বা মধ্যবিত্ত চরিত্রে ততটা পাননি । যে আবেগে জনওয়ারী লুকিয়ে কালোশশীকে নিয়ে অভিসারে যায়, পাখী স্বামীকে ছেড়ে করালীর ঘরে গিয়ে ওঠে উচ্চ শ্রেণীর চরিত্রে সে আবেগ স্তিমিত । তাঁর গল্প উপন্যাসে মানুষের প্রবৃত্তিলীলা প্রকাশ মূলতঃ দুটি সূক্ষ্ম ধারায় বাহিত একটিতে দেখি প্রাণরক্ষার তথা জীবনের তাগিদ অপরটি যৌনচাহিদা । লেখক পরীক্ষা করে দেখেছেন যৌনতার চেয়ে আত্মরক্ষা প্রবলতর প্রবৃত্তি ।

'... মানুষের জন্মগত সংস্কার হইতেছে মরণ হইতে জীবনকে বাঁচানো — দুনিয়ার সর্ব ধর্ম সর্ব দ্রব্যের বিনিময়েও আপন অস্তিত্ব জীব বজায় রাখিতে চায় ; সৃষ্টি হইতে এই নগ্ন সত্যটাকে মানুষের ইতিহাস প্রমাণ করিয়া আসিয়াছে ।'[৪০]

৩৯। নির্মলেন্দু ভৌমিক —'ধাত্রীদেবতা : তারাশংকরের এক পর্ব',
তারাশংকর দেশ কাল সাহিত্য, পৃ ২২৫ - ২৬

৪০। চৈতালী ঘূর্ণি (অন্তিম অংশ) মন মাটি মানুষ , পৃ ২৯৫

'বিচারক' উপন্যাসে জনমগ্ন মগেন তার আত্মরক্ষার অন্তর প্রেরণায় ছোট ভাই ধগেনকে গলাটিপে মেরেছে। বিচারক জানেন্দ্রনাথ ধীশক্তিসম্পন্ন সংযমী এবং সুবিবেচক হওয়া সত্ত্বেও, গৃহে অগ্নিকান্ডকালে স্ত্রী সুমতির হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে এলা নিরাপদ স্থানে পৌঁছেছেন প্রাণের আদিম চেতনায়। স্নেহ, প্রেম, বাৎসল্য এমনকি যৌনতার চেয়ে যে জীবনবাদ অনেক প্রবলভাবে মানুষকে চালনা করে, লেখক তা দেখিয়েছেন। 'তারিণী মাঝি' গল্পে ~~দেখতে~~ দেখতে পাই স্ত্রী সুধীর প্রতি ভালবাসা ও মমতা সত্ত্বেও তারিণী বন্যায় তাকে উদ্ধারকালে মধুরাণীর ঘূর্ণিতে নিমগ্নপ্রায় অবস্থায় 'উন্মত্ত ভীষণ আক্রোশে' তার গলাটিপে মেরে কর্দমমুক্ত হয়ে আত্মরক্ষা করল। দেহজ কামনা যে জীবনের এক অপ্রতিরোধ্য নিয়ন্ত্রক শক্তি এবং বহু প্রকারে তার প্রকাশ ঘটে — তাঁর পর্যবেক্ষণলব্ধ এই উপলব্ধিতে রাঢ়ের জনবিন্যাস ও সামাজিক পরিবেশ সহায়ক হয়েছে। রাঢ় অঞ্চলে, বিশেষভাবে বীরভূমে, সহজিয়া বৈষ্ণব, বাউল এবং তান্ত্রিকদের ধর্মীয় সাধনা ও আচার বিচারে নরনারীর ঘনিষ্ঠতার সুযোগ ছিল। ফলে দৈহিক সম্পর্কের সম্ভাবনা যেমন বেশি তেমনি সামাজিক বাধাও কিছু শিথিল ছিল। লেখক এদের মধ্যে দেখেছেন অতিন্দ্রীয় উপলব্ধি বা ভাবানুভূতির পাশাপাশি সক্রিয় রয়েছে যৌনাবেগ — আবদমন ও ঊর্ধায়নের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে যার প্রকাশ ঘটে চিন্তায়, কথায়, আচরণে। প্রৌঢ় বাউল রসিকদাসের অন্তরে ও দেহে, কিশোরী কমলিনীকে পেয়ে জেগে ওঠে অজর-ক্ষুধা। 'গণদেবতা'য় বস্ত্রিগত ভেটিনু মতীনের চোখেও এই পরিবেশের প্রভাবে কেমন করে সুধীর প্রতি কামনার রং লাগে লেখক তা দেখিয়েছেন। [৪১]

তারাশংকরের সাহিত্যে চিত্রিত ~~দেহধর্ম~~ দেহধর্মের সঙ্গে কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের রচনায় রূপায়িত যৌনচেতনার আপাতসাদৃশ্যের পশ্চাতে বৈসাদৃশ্যটি লক্ষণীয়। জোম, কাহার, বাজীকর, বেদে প্রভৃতি অন্ত্যজ বলিষ্ঠ, কখনও বা হিংস্র, মাটিঘেঁষা অপরিমার্জিত মানুষের যৌন আবেগ প্রকৃতপক্ষে তাদের অমিত প্রাণপ্রাচুর্যের একটি প্রকাশ। তা যেমন স্বতঃস্ফূর্ত তেমনি দ্বিধা সংকোচহীন। কিন্তু শিল্প সংস্কৃতির প্রভাবে সভ্য, শহুরে মানুষের

৪১। গণদেবতা (পরি ২২) রচনাবলী (৩) পৃ ২১৭

ব্যক্তিগত আচরণ পরিশীলিত ও ঔচিত্যবোধে মাত্রায়িত। যৌনানুভূতির ক্ষেত্রেও রুচি, নীতি ও বিবেকের প্রভাবে আবেগ খণ্ডিত, বাসনা অবদমিত। অনেক সময় কামনা প্রত্যক্ষভাবে পরিতৃপ্তির পথ না পেয়ে বিচিত্র কুটীল সূক্ষ্ম উপায়ে চরিতার্থতার সুযোগ খোঁজে, কখনও বা বিকৃতি লাভ করে। সমকালীন লেখকদের সঙ্গে তারাশংকরের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যও ধরা যায়। কল্লোলীয় লেখকদের রচনায় কামপ্রবৃত্তির (libido) রূপায়ণ প্রধানতঃ ফ্রয়েড, হ্যাভলক এলিস, ইয়ুং - প্রদত্ত মানুষের যৌন আচরণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সমর্থনে পরিকল্পিত; ডুবেয়ুর, এমিল জোলা, নুট হামসুন প্রভৃতি পাশ্চাত্য লেখকের রচনায় প্রদর্শিত উগ্র-পার্থিব দেহবাসনা দ্বারা প্রভাবিত। সেকালের বাঙালী লেখকের রচনায় যৌনপ্রসঙ্গের অতিরেক তাই 'যৌনবিদ্রোহ'[৪২] ও 'খিন্নমানসিক সমুখে বুভুক্ষা'[৪৩] ব'লে অভিহিত হয়েছে। এই লক্ষণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাঙালীর অর্থনৈতিক সংকট, মার্কিক অবক্ষয়বাহিত মানসিক অনিশ্চয়তা ও শূন্যতা এবং অবস্থামুক্তির আগ্রহে তরুণ বাঙালীর অস্থিরতা, বেপরোয়া মনোভাব এবং বৈচিত্র্য সন্ধানের এক তির্যক প্রকাশ। তার মধ্যে এক ধরণের রুগ্নতা বা morbidity আছে।

পল্লীপ্রেমিক ও জমিদারপুত্র তারাশংকর এ জাতীয় নৈতিক সংশয় ও দ্বন্দ্বাক্রান্ত ছিলেন না। কোন ক্লেদ, নিরাশার পরোক্ষ চিন্তায় নয়, তিনি সজ্ঞানে বীরভূমের জনজীবনে দেখা জৈবিক স্পন্দনকে সাহিত্যরূপ দিতে চেয়েছেন। তারাশংকরের উপন্যাসে যৌনতা নরনারীর স্বাভাবিক জীবনোল্লাসেরই অংশ, সমগ্র জীবনাবেগের সঙ্গে জড়িত; বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রদর্শিত নয়। তা বলিষ্ঠ এবং আদিম — অন্তর্মুখবোধে বা বিবেকপীড়নে ক্লিষ্ট নয়। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা উন্মোচন বা মনোবিকলন নয়, জৈবিক আবেগের রহস্যময়তাই দেখাতে চেয়েছেন। ফলে সচেতন কৃত্রিম অতিরঞ্জন ঘটেনি। 'বেদেনী', 'নাগিনীকন্যার কাহিনী', 'যাদুকরী', 'নারী ও নাগিনী', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' প্রভৃতি রচনায় প্যাশনের তীব্রতা ও বিচিত্র প্রকাশ বিস্ময়কর হলেও চরিত্রানুসারী। রূঢ় -কঠিন

৪২। দেবীপদ ভট্টাচার্য — উপন্যাসের কথা ১৩৬৮ মুক্তধারা প্রা লি. কলি, পৃ২২৮

৪৩। 'বেদে' উপন্যাস সম্মুখে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে রবীন্দ্রনাথের পত্র (১৩৩৫ সন) কল্লোল, বৈশাখ ১৩৩৬

লাল মাটির বুকে, লাল মহুয়ার দেশে তিনি জীবনশক্তির বহুতর লীলা দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টির ঋজুতায় চরিত্র ও তার কাছ ঐ লীলাক্ষেত্রসংলগ্ন অবস্থায় স্বাভাবিকতাভ্রষ্ট হয়নি। ভূদেব চৌধুরী তারাশঙ্করের এই বৈশিষ্ট্যটির উল্লেখ করেছেন — '... মানুষকে তারাশঙ্কর আদিম মৌলিক প্রকৃতি - ধর্মের মধ্যে লালন করেছেন বলে, অতিশয় Sophistication -এর প্রভাবে তাঁর জীবনচিন্তা এবং গল্পের পাত্রপাত্রী তাদের আদিম প্রবৃত্তিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে নি।'[৪৪]

প্রবৃত্তির মাত্রা ও প্রকারভেদে মনুষ্যচরিত্রে যে তারতম্য দেখা দেয় এবং শেষতঃ তৈবিক আবেগই যে ব্যক্তির মুখাত মিল হয় অর্থাৎ কৃতকর্মই নিয়তির রূপোঘরূপ পরিগ্রহ করে তারাশঙ্করের এই উপলব্ধি অনেক রচনায় প্রতিফলিত। 'অগ্রদানী' গল্পে কৃতান ভারগ্রস্ত উদরপরায়ণ ব্রাহ্মণ পূর্ণ চক্রবর্তী লোভের বশে নিজের শিশুপুত্রকে ধনী শ্যামাদাসের মৃতপুত্র কৃতানের সঙ্গে বদল করল গোপনে; শ্যামাদাসের স্ত্রীর শ্রাদ্ধে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ হ'য়ে পুরস্কার পেল। আর একদিন সেই ছেলেটির শ্রাদ্ধকর্মে অগ্রদানী হ'য়ে পিণ্ডগ্রহণকালে সে নিয়তির মুখোমুখি হ'ল। 'আধডাইয়ের দীঘি' গল্পে নরঘাতক কালী বাগ্দী নৃশংস নেশায় একদা তার একমাত্র ছেলেকে চিনতে না পেরে খুন করে ফেলল। নিয়তির প্রতিশোধে জনুচক্ষু, বিকারগ্রস্ত কালীর মৃত্যু হল সেই আধডাইয়ের দীঘির জলহীন খাদে, যেখানে সে তার বংশধরের লাশ পুঁতে রেখেছিল। 'বিচারক' উপন্যাসে বিধিলিপির মতোই এক অনিবার্য পরিণাম মুমতি নিজে হাতে তৈরী করেছিল। তার জ্বালানো আগুনেই সারা বাড়ীতে লেগেছিল, তারই ভাঙা কাঁচ পায়ে বিঁধে সে লুটিয়ে পড়েছিল। 'রাধা'য় কৃষ্ণদাসীর উন্মাদগ্রস্ততা, রাধারমণ ও অক্রুর এবং গোপালানন্দের অপঘাতমৃত্যুর কারণ তাদের বল্গাহীন ইন্দ্রিয়াসক্তি।

নিয়তিকে তারাশঙ্কর অতিপ্রাকৃতের পূর্বনির্ধারিত অলঙ্ঘ্য শক্তিরূপে দেখাতে চাননি। এ বিষয়ে টমাস হার্ডির সঙ্গে তাঁর পার্থক্যটি উল্লেখনীয়। 'The Mayor of Casterbridge' এ হেনচার্ডকে যদিও তার কৃতকর্মের (স্ত্রী কন্যা বিক্রয়) জন্য

৪৪। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, পৃ ৬১২

ভুগতে দেখি ,' Tess of the D'Urbervilles' এ টেসকে তার পরিণতির জন্য দায়ী করা যায় না । হার্ডির চরিত্ররা প্রতিকূল বিশ্বশক্তি বা নিয়তির চক্রান্ত দুঃখভোগ করে । ব্যক্তির জীবনপ্রকৃতিই রচনা করে তার পরিণামী ভাগ্য — এই উপলব্ধির সঙ্গে তারাশংকর কোন উপদেশ বা moral যুক্ত করতে চান না । তিনি এই জীবনরহস্যের দ্রষ্টা ; ব্যাখ্যাকার নন । তিনি দেখেছেন — অকৃত্রিম , মাটিঘেঁষা মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির, বিশেষতঃ জীবজন্তুর অনুভূতিগত দূরত্ব বেশি নয় ।'কালাপাহাড়' গল্পে দুটি মোষের বন্ধুত্ব হয় রংলালের সঙ্গে ; 'নারী ও নাগিনী' গল্পে খোঁড়া শেখের সঙ্গিনী হয় সাপ ।

(৭) ঔপন্যাসিক তারাশংকরের জীবনদর্শনে সকল বক্তব্যকে ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর সুগভীর মানবতাবোধ । ভালমন্দ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি দরদ তাঁর রচনায় উৎসারিত । সমাজে ঘৃণিত, অপাংক্তেয় , ভ্রান্ত , কর্মফলভোগী , অনুতপ্ত , দুঃখী নরনারীর প্রতি তাঁর সহানুভূতি প্রবল ।'কবি'তে বসনের নারীহৃদয়ের অভিমান , অচরিতার্থতার বেদনা, পতিতা রমণীদের জীবনপিপাসা, 'রাইকমলে' মরণাপন্ন পরী বা নাগিণী কন্যা শবলার দুঃখ , শূন্যতাবোধ মর্মস্পর্শী হয়েছে লেখকের মমতার স্পর্শে । 'কবি'তে নিতাইয়ের প্রতি আলিপুরের বৈষ্ণব মহান্তের সান্ত্বনাবাক্যে তারাশংকরের উদার মানবপ্রেমের পরিচয় আছে —'জন্ম তো বড় নয় বাবা , কর্মই বড় । * * * প্রভুর সংসারে নীচ কেউ নাই বাবা ।' [৪৫]

এই সুভাবজ, অহৈতুক মানবদরদ তাঁকে কখনই নিরাশ ও মন্দগ্রাহী (সিনিক) হতে দেয়নি ; তাঁর মনে সক্রিয় ছিল এক প্রবল আস্তিক্যবোধ । প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা গল্প-উপন্যাসে শহুরে মানুষের হতাশা, সংশয়, অনাস্থা বেশি মাত্রায় আত্মপ্রকাশ করছিল ; তার কারণ অনুমান করা চলে — নগর জীবনের বিবিধ সমস্যা , নাগরিক মানুষের কপটাচার ভণ্ডামি প্রতারণা ও তার প্রতিক্রিয়ায় কৃত্রিম জীবনযাপন , মধ্যবিত্তের আদর্শগত সংকট , অর্থনৈতিক দুরবস্থা ইত্যাদির জটিল মিশ্রণ । এ সবের বিপরীতে

৪৫। কবি — পৃ ১১০

তারাশংকরের কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত আশাবাদ তাঁর অভিজ্ঞতার নির্যাস । রবীন্দ্রনাথ শহরে বাস করেও মধ্যবিত্ত ও বিত্তহীনের রূঢ় বাস্তব সমস্যার নিগূঢ় পরিচয় পান নি । তারাশংকর বাগ্দী বাউরী বায়েন সাঁওতালদের জীবন সংগ্রাম, জমিদার ব্যবসায়ীর শাসন-শোষণ, নানা চরিত্রের মানুষের বিচিত্র প্রবৃত্তিচালিত আচরণ প্রত্যক্ষ করেও মানুষ সম্পর্কে নিরন্তর আশাবাদী । 'তামস তপস্যা'য় দেখা যায় অনেক দুঃখযন্ত্রণায় পানুর জীবনানুভূতির উত্তরণ ঘটেছে । রূঢ় , কর্কশ, বর্বর পানু ধর্মপরায়ণ, কোমল চিত্ত, নম্রভাষী হয়ে উঠল । পানুর স্বভাবের পরিবর্তন বর্ণনায় ঔপন্যাসিকের ভারতীয় অধ্যাত্মভাবনা মিশ্রিত মানবমহিমাবোধ প্রকট হয়েছে ।'তামস তপস্যা'ও'কালান্তরে'র উপসংহারে তমসা থেকে জ্যোতির্লোকে উত্তরণের ঔপনিষদিক আকাঙ্ক্ষা লেখক চিরকালের মানুষের মধ্যে দেখতে চেয়েছেন ।

[গ]

'তারাশংকরের হৃদয়টি বিশাল, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি যে তুলনায় কম পরিচ্ছন্ন' — কাজী আবদুল ওদুদের ও এ মন্তব্যে তারাশংকরের জীবনবোধের গুণ ও সীমাবদ্ধতার ইঙ্গিত আছে । [৪৬] তাঁর উদার হৃদয়ের একটি পরিচয় আছে তাঁর সমন্বয় প্রচেষ্টায় । হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছেন —'..... বিচিত্র বর্ণের বাঙালী জীবন অবলোকন ও অনুধাবনে চক্ষুষ্মান ও হৃদয়বান এই যশস্বী কখনো সমাজের তত্ত্ব ও কর্মযজ্ঞকে অবজ্ঞেয় মনে করেননি, বৈরী শিবিরেও মিশে যান নি ।' [৪৭] অভিজ্ঞতার স্তর থেকে জীবনবেদ নিষ্কাষণের ক্ষেত্রে তারাশংকর আশ্চর্যরকম সমন্বয় - প্রয়াসী । পরিচিত প্রাচীনকে ভালবেসেও তাকে বিদায় দিয়ে নবীনকে স্বীকার , মানুষের স্থূল দেহসত্তাকে লঘু না ক'রে দেহোত্তর প্রেম ও অধ্যাত্মচেতনার প্রশংসা তাঁর সমন্বয়ী দৃষ্টির নমুনা । তিনি শাক্ততেজের সঙ্গে বৈষ্ণবোচিত নম্রতা, প্রেম ও অহিংসার সহাবস্থানে বিশ্বাসী, গান্ধীজী তাঁর ভে- নেতা , সুভাষচন্দ্রের তিনি গুণমুগ্ধ । রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তিনি

৪৬। কাজী আব্দুল ওদুদ — শরৎচন্দ্র ও তাঁর পর ।
১৯৬১ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড
পাবলিশিং কোং , কলি, পৃ ১৪৬

৪৭। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় — তরী হতে তীর । ১৯৭৪ , মনীষা গ্রন্থালয়, পৃ ৪৪০

প্রত্যক্ষ করেন 'সনাতন', 'চিরন্তন' 'জীবনমুক্তির' অর্থাৎ ভয়, ক্ষুদ্রতার বন্ধন, অভাবের পীড়ন ও অশুভ প্রভাবের নির্যাতন অতিক্রমণের সাধনা। তাঁর নিজ অঞ্চলের অনুত্তাল জীবনধারায় লেখক 'মানবীয় মহিমার সনাতন লীলা'য় জীবনমুক্তির সংগ্রামকেই অনুভব করেছেন।[৪৮] অহিংসা ও অন্তিবোধ - অন্বিত কমিউনিজমের আদর্শ আছে 'মন্বন্তরে'র বিজয়বাবু চরিত্রে। তারাশংকরের সমন্বয়-প্রয়াসী হৃদয়ের আক্ষেপ এই যে, এদেশীয় কমিউনিস্ট সাহিত্যিকরা মার্ক্সীয় দর্শনের সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের মিলনসাধনে তৎপর হননি।[৪৯]

কিন্তু তাঁর রচনামধ্যে বিবিধ বিরুদ্ধ শক্তি ও আদর্শের মূল্য যথাযথ গুরুত্বে বা তুলনায় আলোকে নিরূপিত হয় না, সরাসরি নিজস্ব সিদ্ধান্তমণ্ডিত হ'য়ে পড়ে। এবং সেই অভিমতের মূলে তাঁর শৈশব অভিজ্ঞতা, কুলগত প্রথা অনেকটা প্রশ্নাতীত মান রূপে সক্রিয় থাকে। কোন পথে বিভিন্ন জীবনাদর্শের বা পদ্ধতির কী পরিমাণ সামঞ্জস্যসাধন সম্ভব তার বিশ্লেষণ পাই না। তাই কোন ক্ষেত্রে বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ হয়। আর, আত্মজিজ্ঞাসা ও যুক্তির স্তর, যা লেখককে সমন্বয়ী বিশ্বাসে উপনীত করে, তা রচনায় স্থান পায় না বলে 'দোদুল্যমানতা', 'কাল্পনিকতা' এবং 'অসঙ্গতি' ও স্ববিরোধের' অভিযোগ ওঠে।[৫০] অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে ধারণাবদল সর্বদা স্ববিরোধ নয়, মানসিক সচলতার লক্ষণ। তবে যথার্থই অনেক সময় স্ববিরোধ প্রকট হয় তাঁর মন্তব্যের অসঙ্গতিতে, আকস্মিকতা ও অস্পষ্টতায়। যেমন, তিনি কালান্তরে আশান্বিত অথচ পুরাতনের মোহমুক্ত হতে পারেন না। তাঁর একথাও সত্যি নয় যে —'ঋতুর পর অন্য ঋতুর মত কাল হতে কালান্তর আপনিই আসে।'[৫১] ব্যক্তি ও সমাজের অনেক স্বার্থের টানাপোড়েন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় যে যুগক্রান্তি ঘটে থাকে তার প্রতিফলন তাঁর

৪৮। আ সা জী (২) পৃ ১০৭ - ৮

৪৯। আ সা জী (২) পৃ ১৭৪

৫০।(ক) দীপেন্দু চক্রবর্তী —'তারাশংকরের সমাজচেতনা ....' তারাশংকর : দেশ কাল সাহিত্য পৃ ১০, ১৪, ১৭, ২৫

(খ) দেবীপদ ভট্টাচার্য — মুক্তি চৌধুরীর 'ঔপন্যাসিক তারাশংকর' গ্রন্থের ভূমিকা।

৫১। [আ. কা. ক. পরি ১১] মনের আয়নায় — পৃ ১০৭

জানপদ উপন্যাসগুলিতে আছে। বিনীয়মান কালকে ধরাশায়ী বনস্পতির সঙ্গে তুলনা করেন কিন্তু কোন দোষে তা ধরাশায়ী বা পরিত্যক্ত হ'ল তার বিশ্লেষণ ও সমালোচনায় লেখকের আগ্রহ কমই দেখি। বরং তিনি এই প্রকার মোষণায় আত্মপ্রসাদ পান —'সে কালকে আমি শ্রদ্ধা করি, প্রণাম করি, তার মহিমার কাছে আমি নতমস্তক।'[৫২] 'উর্বরতা' ও সৃষ্টি সমারোহকে' উপযুক্ত সমাদর না ক'রে যে ঐতিহ্যপ্রীতি আবর্জনাময় পুরাতনকে 'বিশ্বাস করতে না পারলেও' তর্ক তোলে না, সে সংশ্লেষণী মানসিকতা 'সেকাল'কে কোন অংশেই 'ভ্রান্ত' বলতে কুণ্ঠিত এবং কালান্তরের ব্যবধান বিষয়ে সচেতন হয়েও নিঃ সিদ্ধান্ত করে'আমার সেকাল তার একালের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নাই' তার যুক্তিপদ্ধতি প্রায়ই স্পষ্ট হয় না।[৫৩] তাঁর জীবনদর্শনে কিছু অসঙ্গতির মূলে আছে তাঁর বোধি, প্রজ্ঞা ও মননের দ্বন্দ্ব। অচেতন বিশ্লেষণকালে তিনি যে আপন আদর্শবাদের আলোকে ঘটনা ও চরিত্রকে বিচার করে থাকেন 'ধাত্রীদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'গণদেবতা', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা', 'পদচিহ্ন' 'কালান্তরে' তার দৃষ্টান্ত আছে। আবার হৃদয় ও বোধসম্পন্ন তারাশঙ্কর মানবজাতির চিরন্তন মানবিক রূপ দর্শনের অভিলাষী। হৃদয়ের সাহায্যেই তিনি জীবনসত্যের সাক্ষাৎ পেয়ে যান। কিন্তু চিন্তা ও বিশ্লেষণকালে তাঁর দৃষ্টি হয়ে পড়ে অগভীর ও স্থানে স্থানে সামঞ্জস্যহীন। তাঁর মন্বন্তর - আদর্শ এই প্রকার একটি উদাহরণ। রূঢ় হলেও এই লেখকের জীবনদৃষ্টির অসুস্থতা বিষয়ে কাজী আবদুল ওদুদের উত্থিত মন্তব্যটি, তাই, সত্য প্রতিপন্ন হয়।

বস্তুত দৃষ্টিভঙ্গির অকৃত্রিম সরলতা তারাশঙ্করের শিল্পিমানসের বৈশিষ্ট্য। বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসুর কবিতায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে যে চিন্তাশীলতা ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি

৫২। [আ কা ক পরি ১৬] মনের আয়নায় — পৃ ১৮১

৫৩। (ক) মনের আয়নায় — পৃ ১৩৭ (খ) [বিচিত্র (চ)] মনের আয়নায়। পৃ ২১১ (ঘ) (আ কা ক পরি ১৬) মনের আয়নায়। পৃ ১৮৫

প্রকাশিত তার সঙ্গে তুলনায় তারাশংকরের জীনদৃষ্টি স্বভাব-সরলতা সহজলক্ষ্য হয়। উচ্চশিক্ষার অভাব এর বড় কারণ নয়। তাঁর মানস বিচরণের ক্ষেত্র, অন্ত্যজ মানুষের জীবন তাঁকে এক ঋজু দৃষ্টি দিয়েছে রাঢ় প্রকৃতির মতই যা উন্মুক্ত, ছায়াহীন, স্বতঃস্ফূর্ত। পল্লীজীবনের রূপায়ণে চেতনপ্রবাহভিত্তিক জটিল মনোবিশ্লেষণ ও সূক্ষ্মতাচর্চার প্রয়োজন তাঁর হয়নি। রাঢ়ের জীবন যেমন অনাড়ম্বর তেমনি এক গ্রামীণ মন নিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যরসে জারিত করেছেন। উপাদান ও দৃষ্টিভঙ্গির এই ~~প্রকা~~ প্রকার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য তাঁর সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্যরূপে অনুভূত হয়।